"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৪ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রিত সংখ্যা : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জাল সংখ্যা : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৪৯তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১১ই বৈশাখ, ১৪৩১ / 24.04.2024

:- সম্পাদক -:

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

আমাদের লক্ষ্য	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আমাদের কথা	সম্পাদক
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
সবার মা সারদা	শ্রী প্রণব ঘোষ
দুবাইয়ের দুই অবাক কাণ্ড	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
অবভাসিক	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Introduced by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine: RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720.

DO NOT COPY

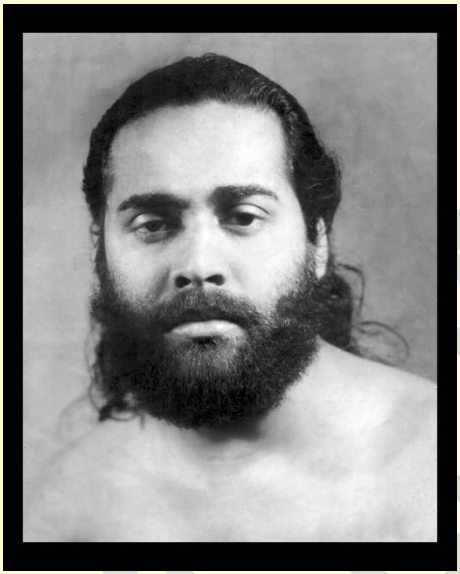

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

আমাদের লক্ষ্য **শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ**

জন্মান্তরের ধারায় অবগাহনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতায় উত্তরণের সাধনা মানবের। পূর্ণতা - যা আপনাকে জানার মধ্যে, পূর্ণতা - যা আপনার অন্তরতরে সেই পরমকে পাওয়ার মধ্যে। সেই সার্থকতার তীর্থে উপনীত হওয়ার মহান শক্তি দান করে - আত্মকেন্দ্রিকতা নয় আত্মবিস্তার। কারণ উপনিষদ বলেছেন - "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম"- "এই যাহা কিছু চরাচর বস্তু দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে।" তাই আপন অন্তরে সেই পরম পুরুষের অলক্ষ্য আগমনকে সূচিত করার পথ কর্মমুখর মহাবিশ্ব জীবনের নন্দন স্পন্দন ছন্দে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করে তোলা। তার জন্য

DO NOT COPY

প্রয়োজন আত্মনিবেদন, তৎপূর্বে আত্মপ্রস্তুতি। মানব জীবনের ভিত্তি ধর্ম, যা আমাদের উত্তীর্ণ করে উচ্চতর চেতনায়, দান করে আত্মশুদ্ধি-আত্মশক্তি। এবং ধর্মের মূল একক প্রেম। প্রেম ও শ্রদ্ধার সমন্বয়ে জাত সেবা ও ত্যাগের মহিমায় উদ্বোধিত করে তুলতে হবে ব্যষ্টি জীবন ক্রমে সংসার, সমাজ, দেশ। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে মানবের সেবায়। ঈশ্বরের নীরব অবস্থানকে প্রত্যক্ষ করতে হবে মানব জীবনের দেহ মন্দিরে অধিষ্ঠিত অন্তরাত্মায়। জীবের প্রতি প্রেমময় সশ্রদ্ধ সেবার অভিব্যক্তিতেই তাঁর সার্থক আবাহন। ক্ষুধার্তের আহার্য সংগ্রহ, নিরাশ্রয়ের আবাস সংস্থান, অজ্ঞানতার আবর্তে অবগাঢ় মানবের অন্তরে চেতনার সঞ্চার - তাঁরই পূজার রূপভেদ মাত্র।

প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে প্রাত্যহিকতার কোন গ্লানি কোন মালিন্য যেন স্পর্শ না করে আমাদের হৃদয়কে। যে সমদর্শিতা যে সহমর্মিতা আমাদের পথ নির্দেশক - তাকে রক্ষা করতে হবে অমেয় সতর্কতায়। মনে রাখতে হবে ত্যাগ না থাকলে সেবায় পূর্ণতা আসে না। মনে রাখতে হবে অর্জিত ঋদ্ধির কল্যাণকর প্রয়োগেই সিদ্ধির সার্থকতা।

অমৃতের পুত্র আমরা। অপ্রতিহত গতির প্রাবল্যে সকল প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করে আমাদের জয়যাত্রা - আলোকের দিকে - অসীমের দিকে। আমাদের সিদ্ধি অনিবার্য।

জয়তু পার্থসারথি!

DO NOT COPY

আমাদের কথা

কেটে গেল চার চারটে বছর। বৈশাখ, ১৪৩১ সংখ্যার মাধ্যমে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করলো পার্থসারথির অন্তর্জাল সংখ্যা। ১৯৬০ এর জুন মাসে প্রথম প্রকাশের হিসেবে আগামী আষাঢ়ে 'পার্থসারথি' মাসিক পত্রিকা পা রাখবে ৬৫তম বছরে।

২০২০ সালের ২৪শে এপ্রিল কোভিড-জনিত লকডাউনের অকল্পনীয় অনুশাসনের পরিমণ্ডলে দেশব্যাপী ছাপাখানা বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয়েছিল পার্থসারথি পত্রিকার নবরূপে প্রকাশ - প্রথম অন্তর্জাল সংখ্যা। তার আগে ষাট বছর ধরে এই পত্রিকাকে প্রতিমাসে ছাপার হরফে প্রকাশ করার জন্য যে জটিল কর্মপ্রণালী ছিল, কম্পিউটার নির্ভর ই-ম্যাগাজিন তার আমূল পরিবর্তন করে দিলো।

মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশের প্রথম পর্যায়ে থাকতো সম্পাদকের দায়িত্ব -- লেখা বাছাই, সূচীপত্রের বিন্যাস, পত্রিকার অলঙ্করণ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ছিল প্রেসে। ম্যাটার কম্পোজ করা, ছবি ছাপতে হলে ব্লক তৈরি করা, খসড়া বইয়ের কম্পোজ ও প্রুফ তৈরি, সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে প্রুফরিডিং, পরিবর্দ্ধন পরিমার্জন, এরপর ফাইনাল বইয়ের প্রিন্টিং, বাইণ্ডিং।

প্রেস থেকে ছাপা হয়ে বই বাড়িতে এলে কাজ শুরু তৃতীয় পর্যায়ের। খামে গ্রাহকের ঠিকানা লেখা, পোস্টাল স্ট্যাম্প লাগানো, সব শেষে বইয়ের বোঝা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্বীকৃত (রেজিস্টার্ড) ম্যাগাজিনের বাল্ক পোস্টিংয়ের জন্য প্রতিমাসের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে জিপিও এবং কলুটোলা পোস্ট অফিসে দীর্ঘ লাইন দেওয়া। দায়িত্বগুলো মূলতঃ প্রকাশক-সম্পাদকের হলেও স্বামীর চাকরী রক্ষার দায়ে অধিকাংশ মাসেই সে দায়িত্বের সিংহভাগ বহন করতেন তার সহধর্মিনী।

পিতা শ্রীপ্রীতিকুমার যখন মাত্র ষাট বছর পূর্ণ করে হঠাৎ চলে যান তখন এই কলমচির চাকরীর বয়স মাত্র তিন বছর। ১৯৮৬-তে প্রকাশনার খরচ তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও সরকারী কর্মচারীদের মাইনেও ছিল যথেষ্ট কম। তাই ঐ সময়ে পত্রিকার অর্থনৈতিক হাল ধরেছিলেন জননী শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ।

DO NOT COPY

১৯৯২ থেকে গৃহিণী সোমা দেবীর উপর পত্রিকার দায়িত্ব বাড়তে লাগল। প্রথমে ছিল ঘরের কাজ – খাম লেখা, প্রতিটা খামে বই ভরা, গ্রাহক তালিকা মিলিয়ে পোস্ট অফিস ভিত্তিক বাণ্ডিল তৈরি করা...। এই কলমচির বিভিন্ন জেলায় বদলীর ফলশ্রুতিতে বাইরের কাজের দায়-ও ক্রমশঃ গৃহিনীর উপর চাপছিল, প্রেসে যাওয়া, জিপিও-তে বই পোস্ট করা ...।

লকডাউনের অস্থিরতার মধ্যেই মাসিক ই-পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত রাখার জন্য খুব দ্রুত পেশাদারী দক্ষতায় তৈরি হয়েছিল নিজস্ব ওয়েবসাইট 'পার্থসারথি পত্রিকা ডট কম'। মার্চ, ২০২০-তে ছাপার বই প্রকাশের পর্যায় শেষ করে এপ্রিল, ২০২০ থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অন্তর্জাল সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রেস আর পোস্ট অফিসের প্রয়োজন শূন্য হয়ে গেল। শুরু হোল আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় নতুন ফর্ম্যাটে নতুন পদ্ধতিতে পার্থসারথি পত্রিকা প্রকাশের নতুন অধ্যায়।

জন্মলগ্ন থেকে প্রতিমাসে ই-বই তৈরি, সার্ভারে আপলোড এবং নির্দিষ্ট পাঠকদের মোবাইলে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব এই কলমচির। ভার্চুয়াল পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন কয়েকটা বিষয়ের অভিজ্ঞতা - কভার ডিজাইন, ফর্ম্যাটিং, কপি টাইপিং, এডিটিং, গ্রাফিক ডিজাইনিং, ফটো এডিটিং, ফন্ট সাইজ, ফন্ট স্টাইল, পেজ লে আউট ইত্যাদি। শ্রীমতী সোমার প্রভূত অবদান থাকে প্রতিমাসের কপি-টাইপিং-এর ক্ষেত্রে।

ই-বুক প্রকাশিত হবার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়েছে পার্থসারথির পাঠক গোষ্ঠীর উপরে। ছাপা বই সব সময়েই গ্রহণযোগ্য যে কোনো বয়েসের পাঠক-পাঠিকার কাছে। কিন্তু ষাটোর্দ্ধ পাঠক-লেখকের একাংশ ডিজিটাল টেকনোলজিতে অভ্যস্ত হলেও আরো অনেকেই হতে পারেন নি। তাঁরা ছাপার বইয়ের অভাবের জন্য খেদ প্রকাশ করেন। বিপুল ব্যয়ে ওয়েবসাইট নির্মাণের পর প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ফিরে যাওয়া ছোট পত্রিকার পক্ষে সাধ্যাতীত। তাই নতুন মাধ্যমে প্রসারের তাগিদে পার্থসারথি খুঁজে নিচ্ছে আধুনিক প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকাদের - যারা স্মার্টফোন, ট্যাব কিংবা ল্যাপটপে বই পড়তে অভ্যস্ত, ইন্টারনেট ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সড়গড়।

DO NOT COPY

প্রথম প্রথম 'ধর্মীয় পত্রিকা' ব্যাপারটা নিয়ে অল্পবয়সীদের অনেকেরই সংশয় ছিল। তার উপর তারা অনেকেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিজ্ঞাসা বাড়ছে, আগ্রহ বাড়ছে। তাদের ভালোলাগাকে মর্যাদা দিয়ে পত্রিকার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে লেখার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হচ্ছে।

মুদ্রিত পার্থসারথি পত্রিকা সারা ভারতের বিভিন্ন আশ্রম, লাইব্রেরী, সমাজ -সেবী প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হত। ই-বুক সেই শূন্যতা পূরণ করতে সময় নেবে।

যে কোন লিটল ম্যাগাজিনের কাছে এটা অনেক পুরোনো প্রশ্ন - কি লাভ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোয়? উত্তরটাও পুরনো। সাহিত্যের বিবর্তন ও জাতির বিনির্মাণে সমস্ত সচেতন সমাজেই ছোট পত্র-পত্রিকার অসামান্য ভূমিকা থাকে। পার্থসারথি ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী ছোট পত্রিকা। এই ধর্ম শ্রীচৈতন্যের ধর্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম -- যে ধর্মের প্রাণশক্তি মানবতা। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইহুদি, পার্সী, মুসলমান নয় – মানুষ – সবার প্রথমে সবার উপরে মানুষ। হাজার বছর ধরে বিদেশী শাসন ও শোষণের কুপ্রভাবে সারা দেশের সমাজ জীবনে ব্যাপক কুসংস্কার, দুর্নীতি, বিভেদ, সংঘাত, বিচ্ছিন্নতাবোধ বিস্তার লাভ করেছে; সামাজিক অবক্ষয়কে রোধ করার জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধের প্রসার, ভারতীয়ত্বের বিকাশ।

বড় পত্র-পত্রিকার বিপণন বৃহৎ পরিসরে। তাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও লোকবল অনেক বেশী। সেখানে লাভ ক্ষতির খতিয়ান আছে। লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশনায় লাভের কল্পনা করেন না কেউ। পার্থসারথির মত ছোট কাগজ বা লিটল ম্যাগাজিনের প্রবর্তকরা সমাজে মুক্তচিন্তার বিকাশের লক্ষ্যে সীমিত সামর্থ্য নিয়ে প্রকাশনায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। কারো শক্তি তার পরিবার, কারো বন্ধু-স্বজন। সবচেয়ে জরুরী হোল জেদ - হার না মানার সংকল্প। আর্থিক অস্বচ্ছলতার সঙ্গে সমঝোতা করতে করতে আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে পারাটাই তাঁদের প্রাপ্তি।

DO NOT COPY

পার্থসারথির কৃপায় শ্রীপ্রীতিকুমারের আশীর্বাদে ৬৪ বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে পার্থসারথি পত্রিকার জয়যাত্রা। এই পত্রিকার প্রতি নতুন প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এই বিশ্বাস রাখি।

জয়তু শ্রীপ্রীতিকুমার! জয়তু শ্রী পার্থসারথি!

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

পার্থসারথির জন্মদিনের পর লেখার উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ একটা ভালো খবর এসে গেল। আমার পুত্তর, পার্থসারথির সম্পাদক শ্রীমান সুনন্দন ঘোষের Academy of Fine Arts-এর New South Gallery-তে একক ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনী। চলবে ২৫শে জুলাই থেকে ৩১শে জুলাই, ১৯৯১ পর্যন্ত। বেচারা পাগলের মতো ক্যামেরা নিয়ে ছোটে। কোথায় একটা কাককে ছাগলে পদাঘাত করছে দেখে ক্যামেরা নিয়ে দৌড়ালো। ততক্ষণে কাকটি প্রায় হাওয়া। পাহাড়ে গিয়ে Team-এর Leader হওয়া সত্ত্বেও সবার পিছনে যায়। কারণ থেমে থেমে ফটো তোলবার অভ্যাস। আমি এই দু'মণি দেহ নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটি। খুব নিশ্চিন্ত মনে এগোই। কারণ জানি Leader পিছনে আছে। যদি ও আমার আগে চলবার ব্যবস্থা করে, সঙ্গে সঙ্গে ওকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করি। ব্যাস্! পুত্রের গতিবেগ ধীর হয়ে যায়। দাঁড়িয়ে যায় সেই সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতিকে ক্যামেরাতে ধরে রাখবার ইচ্ছেতে। আমি আপনমনে হাঁটতে পারি। জানি আমার পিছনে একজন সদস্য হেঁটে আসছে।

আমরা ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Rubalkang Expedition-এ গেছিলাম। প্রায় চার পাঁচশো ছবি তোলা হয়। ফেরার পর পারিবারিক বিপর্যয়, শ্রীপ্রীতিকুমারের অসুস্থতা ইত্যাদির জন্য Photo-গুলি একটু দেরিতে Print করা হয়। শেষের দিনেও শ্রীপ্রীতিকুমার বলেছিলেন, "Photo-গুলি দেখা হল না!" পুত্তর

ভেবেছিল একেবারে Album-এ সাজিয়ে বাবাকে দেখাবে। কিন্তু সে সময় আর পাওয়া যায় নি। বাবা যে ওভাবে without notice-এ চলে যাবেন আমরা কেউই ভাবিনি। এখন সেই Photo-গুলি দেখে খুব মন খারাপ হয়ে যায়।

Photo তোলাতে ভীষণ উৎসাহ ছিল। যে ভাবেই থাকুন দাঁড়িয়ে যেতেন। নাতি-নাতনি ও আমাকে নিয়ে তোলা শেষের Photo-টি আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে একটি Master Piece। যখনই তাকাই, মনে হয় বলছেন, "কি কেমন মজা? কেমন লাগছে?" ভালো যে লাগছে না সেটা সর্বজনবিদিত। যে বিপদ সমুদ্রে আমদের নিক্ষেপ করে গেছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু আমাদের ডুবতে দেন নি। সাঁতার কাটতে শিখিয়েছেন হাতে ধরে। আমার মধ্যেও কি অদ্ভুত একটা নির্ভরতা কাজ করে। আমার হয়তো college-এ Invigilation duty সকাল ১০টা থেকে। তিনবার Bus change করে আমাকে college যেতে হয়। হয়ত একটু pray করে ফেলি timely পৌঁছাবার। কিভাবে যেন ঠিক সময়ে পৌঁছে যাই। Court-এ যেতে হয়। শত্রুপক্ষের মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না যেদিন, শ্রীপ্রীতিকুমারকে প্রার্থনা করি যাতে ঐদিন case-টা না হয়! কোনও অজ্ঞাত কারনে সেই case-টি পিছিয়ে যাচ্ছে। গত প্রায় দশমাস ধরে সেই case-টি হচ্ছে না।

আমার পুত্তর যেদিন Academy of Fine Arts-এ permission-এর জন্য গেল, শ্রীপ্রীতিকুমারকে বললাম, "পুত্তরের মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়। ওর হাসিমুখ অনেক বছর ধরে দেখিনি, মনে হল আমার।" শ্রীপ্রীতিকুমারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম চোখে যেন ভরসার ইঙ্গিত স্পষ্ট। আমার ভগ্নীসমা বুলু এ বিষয়ে খুবই উৎসাহী। তাদের কথা details-এ বললাম না, পাছে অন্য কেউ তাকে বিরক্ত করে। যখন শুনলাম পুত্তর date পেয়েছে, আমার চোখে জল এসে গেল। ছেলেটার কতই বা বয়স! এই বয়সে একটা শূন্যতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। শ্রীপ্রীতিকুমারের আশীর্বাদ না থাকলে গত প্রায় পাঁচ বছর তার পক্ষে দিন কাটানোই দায় হতো। আমাদের একটু সামান্য কিছু হারালে জীবন যায় যায়! ওর তো জীবনে কি ভীষণ সমস্যা। আমার একটা কথা মনে হয়েছে যে মেয়েরা বিয়ের পরেও বাবাকে পীর

মনে করে, আর ভাইদের পয়গম্বর মনে করে, তাদের জীবনে অনেক দুঃখ থাকে। আর যে মেয়ের বিয়ের পরেও তার বাবা মেয়ের স্বশুরবাড়ীতে এসে খবরদারি করেন, পরে সেই মেয়েই পিতার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা যে Flat-এ থাকি সেখানকার culture অন্যরকম। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা, আমাদের Flat-এর লোকেদের বাবা-মা নেই? সবারই তো দেখি শ্বশুর ও শাশুড়ি আছে, বাবা মা তো কারো দেখি না! ---- "

আমার এক আত্মীয়া আছেন যিনি অনেক কষ্টে তাঁর বয়স্কা মেয়েকে পার করতে পেরেছেন। এখন গেলেই শুধু সেই মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকেদের নিন্দে শুনতে হয়। তাই ভয়ে যাই না। আমার নিজের জীবনে যথেষ্ট সমস্যা আছে। এখন আর ওসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না।

আমার নিজের তো অনেক দোষ ছিল। যে যাই মনে করুক না কেন (শ্রীপ্রীতিকুমারের) মা এখনও আমাকে দেখলে দুহাতে জড়িয়ে ধরেন। শেষ যেদিন আমার সাথে দেখা হোল, বললেন, "তুমি ভেঙে পড়ো না। মনকে শক্ত রাখ। তাহলে ওর আত্মা শান্তি পাবে। তুমি কষ্ট পেলে ওর আত্মা কষ্ট পাবে ---।" আমি শ্রীপ্রীতিকুমারকে বলেছিলাম, মেয়েরা স্বামীর শোক তবু সহ্য করতে পারে, কিন্তু পুত্রশোক সহ্য করা যে কি কঠিন তা আমি আন্দাজ করতে পারি মা-কে দেখেই। শ্রীপ্রীতিকুমার আমার কথা মানেন নি। তিনি একই কথা বলেছিলেন, "আমার মায়ের মৃত্যু আমি দেখতে পারবো না। আমি আগেই যাবো।" সে কথাই সত্য হয়েছিল।

লিখতে গেলেই লেখনী কেমন ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। এই রীতির জন্য পাঠকরা আমাকে খুব উৎসাহিত করেন। কিন্তু এই উৎসাহ বোধহয় আর বেশী দিন থাকবে না। Newsprint এর দাম যত বাড়ছে, আমার তত সর্বনাশ হচ্ছে। হয় আমাকে গ্রাহক কমাতে হবে, না হলে বার্ষিক চাঁদা বাড়াতে হবে। না হলে পত্রিকাটি চালানো সম্ভব হবে কিনা ভগবানই জানেন। যাঁর ভাবনা তিনি ভাববেন! এমন অনেক গ্রাহক আছেন যাঁরা মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও পার্থসারথিকে ত্যাগ করবেন না। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছেন–তাঁদের নানারকম বায়নাক্কা। By post-এ বই গেলে তাঁরা পান

না। তাঁদের ব্যক্তিগত ভাবে হাতে দিতে হবে। সে কাজ কে করবে? আমরা সকলেই তো সারাদিন ধরে ব্যস্ত থাকি, তার উপর বই পৌঁছাতে আজ বেলঘরিয়া, কাল বেলগাছিয়া, পরশু সল্ট লেক - বই দিতে যেতে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী। বাধ্য হয়ে এই ধরণের গ্রাহকদের পার্থসারথি পড়বার উৎসাহ দিতে পারলাম না বলে দুঃখ স্বীকার করছি।

গত দু'মাসে পরপর তিনটি বিয়ে গেল। এবার যেন ছেলে বা মেয়ে কেউ অবিবাহিত থাকবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। আমার আর বাপীর তো ডাহা Loss। আমি দীর্ঘদিন ধরে কোনও নিমন্ত্রণ বাড়ীতে খাই না। বাপীও বছর পাঁচেক ধরে তার বাবার নির্দেশ মতো কোথাও অন্ন গ্রহণ করে না। ফলে আমার আর Kitchen বন্ধ হয় না। সেই যেতেও হয়, presentation দিয়ে দৌড়ে চলে আসতে হয়, যদি ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজন হয়ে যায়!

শ্রীপ্রীতিকুমার সাধারণত বাইরে (কারো বাড়িতে বা অনুষ্ঠানে) কোথাও কিছু খেতেন না। বিশেষ অনুরোধেও চা ছাড়া কিছু খেতেন না। অথচ কি ভালোবাসতেন Amber, Firpos, Great Eastern-এর খাবার খেতে। আরো ভালোবাসতেন Central Avenue-র K. Allen-এর চিকেন কবিরাজী কাটলেট খেতে। আমরা যদি কোথাও বেড়াতে যেতাম, বা পুজো দিতে যেতাম, জীবনেও সেখানে timely পৌঁছতে পারতাম না। সারা পথ শুধু গাড়ী থামিয়ে চা আর snacks, নিদেন পক্ষে পাঞ্জাবী ধাবাতে রুটি তড়কার ব্যবহার। উপোষী হয়ে পুজো আমি কখনোই দিইনি। শ্রীপ্রীতিকুমারের কোনরকম সংস্কার ছিলনা। "যা প্রাণে চায় তাই কর"—এমন একটা ভাব ছিল।

দমদমের Flat-এ আসবার পর শুধু একটি কথা বলেছিলেন, "আমার বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা, শনি পূজা হবে না আর।" আমিও অবশ্য সেসব পূজা করিনি।

তাঁর মা ঁলক্ষ্মী পূজা করতেন বলে আমাকে কখনও লক্ষ্মীপূজা করতে বলেন নি। আমিও মেনে নিয়েছিলাম। লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আমার আগ্রহের জন্য

শ্রীপ্রীতিকুমার আমার শোবার ঘরে একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট মা লক্ষ্মীর ছবি বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। এবার ১লা বৈশাখের দিন হঠাৎ সেই মালক্ষ্মী বিশাল শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেলেন। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। পুত্র তাড়াতাড়ি আরেকটি দড়ি দিয়ে পিনটি পরিয়ে ছবিটা টাঙ্গিয়ে দিল। একটু নিশ্চিন্ত হলাম। ঠিক দুদিন পরে মাঝরাতে শব্দ পেয়ে আলো জ্বালিয়ে দেখি মালক্ষ্মী দরজার পাল্লার উপর কাত হয়ে আছেন। পিনটি আবার খুলে গেছে। কি করি! ওঁকে তো দোকানে দিতে পারছি না। শ্রীপ্রীতিকুমারের হাতে রাখা মালক্ষ্মী! ঘর থেকে সরে গেলে যদি আবার কোনও সমস্যা হয়! অগত্যা দীপুর দ্বারস্থ হওয়া। গোবিন্দদাকে বললাম উদ্ধার করতে। প্রায় অর্দ্ধ-বাৎসরিক প্রতীক্ষার পর তিনি একটি মালক্ষ্মী এনে দিলেন। তাঁর ওজন আর আমার ওজন প্রায় সমান! সুতরাং সেই মালক্ষ্মীকে জায়গা দেওয়া আমার বেশ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। যাইহোক শ্রীপ্রীতিকুমারের মালক্ষ্মীও দোকান থেকে নব কলেবর ধারণ করে আসতে পারলেন। আমি এখন এই দেবদেবীদের নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি।

শ্রীপ্রীতিকুমার শরীরে থাকাকালীন আমার কোন পূজাআর্চার ব্যাপার ছিলনা। এখন আমার পঞ্চ শিব (একজন শ্রীপ্রীতিকুমার), দুজন লক্ষ্মী, জগন্নাথ, আদ্যামা, তারা মা, শালগ্রাম শিলা, সিংহবাহিনী দেবী, তিরুপতি ইত্যাদি ইত্যাদি। সকালে উঠে এদের নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমার পড়াশুনা, সেলাই, কারও সাথে আত্মীয়তা রাখা দায় হয়ে পড়ে। তারপর যদি কেউ সকালে আসে, আমার মনে হয় ধেই ধেই করি। কিন্তু ভদ্রতা বড় বিষম বস্তু! তাই .....

আমার আরেকজন Local Guardian আছেন। কিশোরবাবু। ওর মামা কবে কোনকালে মামীমার কথা শোনবার পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটা ও মেনে চলে। তারপর কাজ সেরে বাড়ী ফেরার পথে আমার খবর নেয়। মেজাজ যদি আমার ভালো থাকে, ঠিক আছে, অনেক খবরাখবর দেওয়া নেওয়া হয়। কিন্তু মেজাজ যদি খারাপ থাকে, তাহলে মনে হয় মুণ্ডুটা ঠুকে দিই যদি সামনে পাই। অবশ্য আমার যে কোনও আবদার ও রক্ষা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু আজ যে কাজ করবে বলে,

সেটা করে একবছর পর। তাই কোনও কাজ একবছর হাতে রেখেই ওকে করতে বলি। ভাগ্নে আমার এরকম আরো দুটি আছে, একটি অনুবাবু, ও আমার একটা জোরের জায়গা। ওর বাবা মা আমার কথা ভুলে গেলেও ও ঠিক সময় করে আমার খবরাখবর নেয়।

আর আছেন বাপ্পাবাবু। বাপ্পাকে নিয়ে আমরা একবার Annapurna Base Camp-এ Trek করেছিলাম। তখনকার বাপ্পার সাথে আজকের বাপ্পার আকাশ পাতাল তফাৎ। আজকের বাপ্পা অনেক matured। সেদিন বাপ্পাকে old age home-এর খবর নিতে বলাতে এমন অবাক হোল যে বলবার নয়। বলে উঠলো, "--- তুমি কেন Old age home-এ থাকবে?" ওর বলাটা আমার খুব ভালো লাগলো। আমার পুত্তর ছাড়াও আমার যে আরও পুত্তর আছে এটাই আমার মনোবল বজায় রাখতে অনেক সাহায্য করে। আমি একা নই, অসহায় নই। আমার নিজের কোনও কৃতিত্ব নেই। শ্রীপ্রীতিকুমার তাঁর উদারতা, মহানুভবতা, স্নেহ-পরায়ণতা দিয়ে সকলের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক রেখে গেছেন যেটা আমাকে অভিভূত করে এবং আমি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করি যাতে তাঁর সম্মান বজায় রাখতে পারি।

পার্থসারথি পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে ঠিকমত প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি। কতকগুলি জিনিস আমাকে অভিভূত করেছে। ডঃ বি আর সেনগুপ্তের মত খ্যাতনামা চিকিৎসক নীরেনদার সঙ্গে দেখা হওয়াতে পার্থসারথির জন্য টাকা পাঠিয়েছেন। অধ্যাপিকা স্মিতা চৌধুরী বিভিন্ন Occasion-এ চিঠি লিখতে ভোলেন না। মঞ্জুদি সুদূর কটক থেকে নিজের বড় বোনের মত যোগাযোগ রাখেন। একটা কথা আজ প্রকাশ করছি। কিশোরের বোন কণা ও হিলতার মত পাঠিকা এযুগে বিরল। আমার লেখার দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন পর্যন্ত ওরা বলে দিতে পারে। মান্তুর বিয়ের দিন ওদের বর্ণনা শুনে আমি অবাক! আমি মামীমা হিসাবে ওদের খুব আশীর্বাদ করে ফেলেছি।

এমাসের মত লেখা শেষ। আবার ভাদ্রমাসের অপেক্ষায় .....।

- - - - - - - - (** রচনাকাল – জুলাই, ১৯৯১)

রামকৃষ্ণ অবতারের বৈশিষ্ট্য সঙ্গে সারদা মায়ের আবির্ভাব। ঈশ্বরের একটি মাতৃরূপ আছে। স্বয়ং ঈশ্বরী সারদামণিরূপে জন্মগ্রহণ করে সেই দিব্য মাতৃভাব প্রকাশ করেছেন। মা নিজের মুখে বলেছেন- "ঠাকুর জগৎকে মাতৃভাব শেখাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে গেছেন।"

ঠাকুরের শ্বশ্রুমাতা শ্যামাসুন্দরী দেবীর আক্ষেপ ছিল কন্যা সারদার একটা ছেলে হল না! ঠাকুর সে আক্ষেপের কথা জানতে পেরে বলেছিলেন, "একটা ছেলে কি? এত ছেলে হবে যে শেষে আপনার মেয়ে 'মা' ডাকে দিশেহারা হয়ে পড়বে।" ঠাকুরের সে ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল। মায়ের অগণিত সন্তান উপলব্ধি করেছিল, "তিনি গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয় - সত্যি সত্যি মা।" "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।" জগন্মাতার মাতৃত্বের আংশিক প্রকাশ ঘটে জগতের সকল মায়ের মধ্যে। তাতেই সন্তানেরা পরিতুষ্ট। মা সারদার মধ্যে সেই মাতৃত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল। তাই জগতের সকল মানুষকেই তিনি নিজের সন্তান ভাবতে পেরেছিলেন। মায়ের অকৃত্রিম ভালবাসার দুর্নিবার আকর্ষণে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে শত সহস্র মানুষ এসেছে এবং তাঁর অপার্থিব মাতৃস্নেহের মধুর স্বাদ আস্বাদন করে ধন্য হয়েছে।

মা যে সত্যিকারের মা গিরিশচন্দ্র ঘোষ জীবনে তার অনেক পরিচয় পেয়েছিলেন। মাতৃদর্শনে জয়রামবাটী গিয়ে তিনি কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেছিলেন। সেখানকার একদিনের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন, "একদিন দেখিলাম মাতাঠাকুরাণী সাবান, বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদর লইয়া নিকটবর্তী পুকুরঘাটের দিকে যাইতেছেন। রাত্রে শয়ন করিবার সময় দেখি আমার বিছানা সাদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে। এ কার্য মায়েরই বুঝিয়া কষ্টও হইল, আবার মার অপার স্নেহের কথা ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল।"

ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক পাবনা থেকে জয়রামবাটী এসেই মায়ের আন্তরিক স্নেহে মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা না করেই মা জিজ্ঞাসা করতে থাকেন,

“কখন রওনা হয়েচ? রাস্তায় কোথায় খেয়েচ? কী খেয়েচ? রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি তো?” তাঁর উত্তর শুনে মা দুঃখ করে বলেন, “এখানে আসতে বড় কষ্ট; তবু তুমি ছেলেমানুষ একা এতদূর এসেছ।”

পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক সুদূর ময়মনসিংহ থেকে জয়রামবাটী এসেছিলেন। মাকে দর্শন করে তিনি কামারপুকুরে যান এবং সেখান থেকে দেশে ফেরার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু আরামবাগ পার হবার পর মায়ের কাছে ফিরে আসার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়। তখন তিনি জয়রামবাটী ফিরে যান। প্রায় একটার সময় জয়রামবাটী পৌঁছান মাত্র উপস্থিত ভক্তরা বলতে থাকে, “তুমি মাকে বড় কষ্ট দিয়েছ। তুমি রোদে রোদে আসছ বলে মা আগে থেকেই বলছেন তাঁর শরীর রোদের তাপে জ্বলে যাচ্ছে।” সবার অনুরোধে খেতে বসলে মা এলেন এবং তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, “ভয় কি? তোমার চিন্তা নেই, খাও, তুমি শান্তি পাবে।” শেষ রাত্রে উঠে যাত্রা করার সময় দেখলেন চরণধূলি দেবার জন্য মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সুরমা রায় বলেছেন, “আমরা কামারপুকুর থেকে হেঁটে জয়রামবাটী ফিরছিলাম। রাস্তায় ঝড় জল আরম্ভ হোল এবং সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। মা খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। নিজের ঘরের বারান্দায় কেবল এদিক ওদিক করছিলেন আর বলছিলেন, ছোট বউ পাগলী, কি জানি ওদের খাওয়া হোল কিনা, এখনও কেন ফিরছে না? আমরা বাড়ির ভিতর ঢুকতেই মা ব্যস্ত হয়ে ‘এসো মা, এসো মা’ বলে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন।”

মায়ের পরমভক্ত আশুতোষ মিত্র একবার দুর্গাপূজার সময় কলকাতায় বলরাম ভবনে ছিলেন। মাও গিরিশ ঘোষের বাড়ীর দুর্গাপূজা উপলক্ষে বলরাম ভবনে উঠেছিলেন। মিত্র মশাইয়ের হঠাৎ জ্বর হয়। ডাক্তার সাগু পথ্যের বিধান দেন। শরৎ মহারাজ ডাক্তারী বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাই সাগুই রান্না হয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বাবু একদম সাগু খেতে পারতেন না। তাই সাগু না খেয়ে চুপ করে পড়ে রইলেন। শরৎ মহারাজ যখন খেতে যান তখন মা রাধুর হাতে কিছু ফল মিষ্টি পাঠিয়ে দেন, পরে শরৎ মহারাজের অনুপস্থিতির সুযোগে রুটি ও

DO NOT COPY

তরকারী দেন। অথচ আশুতোষবাবু মাকে কিছুই জানাননি। এইভাবে অন্তর্যামিনী মা সর্বদাই সন্তানদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখতেন।

স্বামী স্বরূপানন্দ জয়রামবাটী গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মা দুঃখ করে বললেন, আহা, ছেলেটির জ্বর হয়ে গেল। অসুস্থ স্বরূপানন্দের জন্য পথ্যের ব্যবস্থা করে মা শুতে যান। রাত্রে মারও প্রবল জ্বর হয়। কিন্তু সকাল হলেই জ্বর গায়ে এসে স্বরূপানন্দের খোঁজ করেন, তারপর আবার শুতে চলে যান। প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী থেকেও মা সন্তানের খোঁজ নিতে ভোলেন নি। স্বরূপানন্দ খেতে খেতে শুনতে পান মা বলছেন, "আশু কি খেলে?"

ভাগ্যচক্রে কোন একটি ভক্তকে মঠ ছেড়ে চলে যেতে হয়। বিদায় বেলায় মা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'ভয় কি বাবা, আমি আছি।' তারপর সজল নয়নে বললেন, 'ভুলবেনা জানি, তবু বলছি আমায় ভুলনা।' ছেলে তো কেঁদে সারা। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, আপনি? মা উত্তর করলেন, 'মা কি কখনও ছেলেকে ভুলতে পারে?' তারপর আঁচলে নিজের চোখ মুছে তাঁকে বললেন, 'কলঘরে গিয়ে চোখ মুছে এসো, কেউ যেন টের না পায়।'

একবার জনৈক ভক্ত স্ত্রী ও চারটি মেয়ে নিয়ে জয়রামবাটী আসে। মেয়েগুলি ছোট ছোট, আবার একটি দুগ্ধপোষ্য ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। ভক্তের আশঙ্কা ছিল, হয়ত মায়ের অসুবিধা হবে। কিন্তু মা এমন স্নেহ ও আদরের সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করলেন যে এক মুহূর্তে সব সঙ্কোচ ঘুচে গেল এবং স্ত্রী ভক্তটি যেন বাপের বাড়ী এসেছেন এমন ব্যবহার করলেন। রুগ্না মেয়েটির জন্যে পৃথক শোবার ব্যবস্থা ও ওষুধ পত্রেরও ব্যবস্থা হল। স্ত্রীভক্ত বাড়ীর মেয়ের মতো কাঁখে কলসী নিয়ে বাড়ুজ্যে পুকুরে স্নান করে এলেন। বিদায় বেলায় সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ মা একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

রাখাল নাগ বলেছেন, "শ্রীশ্রীমার কাছে আমি ধর্মলাভের জন্য যাইনি, সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা তিনি যে কোন গুণে বড় তাও জানতাম না। শ্বশুর বাড়ী যাতায়াতের পথে মায়ের দরজায় অল্পক্ষণ বিশ্রাম করতাম; তিনি আমাকে মুড়ি, গুড়

ও জল খেতে দিতেন, যাতায়াতের পথে তাঁর হাতে মুড়ি গুড় খাওয়া আমার যেন একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। ওটা না হলে তৃপ্তি হত না।"

শম্ভুচরণ মণ্ডল বাড়ীতে ঝগড়া করে বার হয়ে যান এবং জয়রামবাটীতে এসে মুনিষের কাজ করেন। মাঠে কাজ করে ঘর্মাক্ত। তৃষ্ণার্ত শম্ভুচরণ যখন বাড়ী ফিরে 'মা জল দাও' বলে ডাকতেন মা তাড়াতাড়ি জল ও গুড় নিয়ে এসে বলতেন, 'লও বাবা, বড় কষ্ট হয়েছে, আহা'; আর নিজের হাতে বাতাস করে তার গায়ের ঘাম শুকিয়ে দিতেন। কোনদিন শম্ভু বাইরে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলে মা হাসিমুখে বলতেন, 'শম্ভু এসেছ বাপ? এস, ভয় নেই, খাওয়া দাওয়া সেরে নাও।'

স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ মঠে থাকতেন। প্রাচীন সাধুরা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর ধারণা হয় বৃদ্ধ সাধুদের আদর পেয়ে তাঁর অভিমান বাড়ছে। এই কারণে তিনি বাইরে গিয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা করেন। মঠ কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেবেন না ভেবে তিনি মায়ের শরণাপন্ন হন। মায়ের কাছে সব কথা খুলে বললে মা জানতে চান তিনি কোথায় যাবেন, সঙ্গে টাকাকড়ি আছে কিনা ইত্যাদি। ব্রজেশ্বরানন্দজী বলেন তাঁর হাত শূন্য, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে কাশী যাবেন। শুনে মা স্নেহসিক্ত স্বরে বলেন, "কার্ত্তিক মাস, লোকে বলে, যমের চার দোর খোলা। আমি মা, আমি কি করে বলি, বাবা তুমি যাও। আবার বলছ, হাতে পয়সা নেই। খিদে পেলে কে খেতে দেবে, বাবা?" ব্রজেশ্বরানন্দজীর আর যাওয়া হোল না।

জনৈক অব্রাহ্মণ ভক্ত মহিলা মাকে কিছু রেঁধে খাওয়াতে চান। মা অনুমতি দেন। পরদিন তিনি রান্না করা খাবার নিয়ে এলে মা বললেন, 'এই দেখ-গো, আবার কত কষ্ট করে এসব জিনিষ নিয়ে এসেছে।' নলিনীদিদি বললেন, 'তুমি চাও কেন? তাই তো নিয়ে আসে।' মা উত্তর দিলেন, তা ওদের কাছে চাইবনা? ওঁরা আমার মেয়ে।' সে রাত্রে খাবারগুলো খেয়ে মা খুব আনন্দ করেছিলেন, এমন কি নলিনীদিদির যে এত শুচিবায়ু, তিনিও বলেছিলেন, "আমার কারু রান্না রোচে না, কিন্তু এর হাতে খেতে তো ঘেন্না হচ্ছে না!" শুনে মা সগর্বে বলেছিলেন, 'কেন হবে? ও যে আমার মেয়ে।'

কয়েকজন ভক্ত জন্মাষ্টমীর ছুটিতে কোয়ালপাড়া পৌঁছে স্থির করেন রাত্রেই জয়রামবাটী যাবেন। সেদিন ভয়ানক দুর্যোগ। অন্ধকার রাত। অবিরাম বর্ষা হচ্ছে, পথ কর্দ্দমাক্ত। মা তাঁদের ভর্তসনা করে বলেছিলেন, "বাবা, ঠাকুর রক্ষা করেছেন। অন্ধকারে অত বৃষ্টি জল কাদায় কত সাপ মাড়িয়ে এসেছ। এই ভাবে চলায় আমার কষ্ট হয়। গোঁ-ভরে চলা ভাল নয় ... তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার বুকে শেল বেঁধে।"

মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে কোন ছেলে হয়ত বাড়ী রওনা হয়েছে। তারপর ঝড়জল শুরু হয়েছে। ঐ ছেলের জন্য মায়ের তখন কি ভাবনা! বলছেন, তাই তো, ছেলেটি আমার যাচ্ছে গো, এতক্ষণে বোধ হয় অমুক জায়গায় গেছে। সেখানে নিশ্চয়ই কোন আশ্রয় আছে। বিভূতিবাবু একবার জয়রামবাটী থেকে যাবার পর মায়ের অমনি ভাবনা। পরের রবিবার তিনি আবার জয়রামবাটী এলে মা তাঁকে বললেন, "বিভূতি, তুমি তো চলে গেলে, জল হচ্ছিল, আমি ভাবছিলুম বিভূতি আমার এতক্ষণে বড় নদী পেরুল!"

মায়ের অসীম স্নেহের কাছে গর্ভধারিণীর স্নেহও তুচ্ছ হয়ে যেত। কোন কোন জননী তা উপলব্ধি করতেন। বিভূতি ঘোষের মা রোহিণীবালা ঘোষ একবার জয়রামবাটী এসে দেখেন বিভূতি বেশ তৃপ্তি করে খাচ্ছে। তিনি তখন মন্তব্য করেন, বিভূতি এখানে তো বেশ খায়, আমার ওখানে মাত্র এত কটি খায়। মা তক্ষুণি বললেন, 'আমার ছেলেকে খুঁড়ো না। আমি ভিখারী রমণী, আমার ছেলেদিকে যা খেতে দি, ছেলেরা তাই আমার আদর করে খায়।'

মায়ের ভালবাসার এমনই বিশেষত্ব যে প্রত্যেকে মনে করত মা তাকেই বেশি ভালবাসেন। নলিনীবাবু নামে জনৈক ভক্ত বেলডিহার শ্যামাদাস গোস্বামীকে নিয়ে মাকে দর্শন করতে যান। দেখা হতেই মা বললেন, 'আহা! তোমরা রাস্তায় কত ঘুরেছ, বাছা কত কষ্ট হয়েছে। আগে জল খাও।' মা তাঁদের দুজনকেই কাছে বসিয়ে মুড়ি, সন্দেশ খাওয়ান। দুপুরবেলায় পনের জন একসঙ্গে প্রসাদ খেতে বসে। মা নিজে পরিবেশন করেন। নলিনবাবুর ধারণা মা তাঁকেই বেশি যত্ন করছেন। তাতে

তাঁর আনন্দ হলেও সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। খাওয়ার পর সেই কথা সবার সঙ্গে আলোচনা করার পর বোঝা গেল পনেরজনের সবারি একই অনুভূতি হয়েছিল। প্রত্যেকেই অনুভব করেছিলেন মা তাঁকে বিশেষ যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন।

কাছে থাকলেই যে মায়ের স্নেহ মেলে দূরে চলে গেলে যে মা ভুলে যান, তা নয়। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ কাছে না থাকলে মায়ের মন ভারি উচাটন হত। তবে ভাব চাপবার ক্ষমতা ছিল অসীম। তাই বাইরে থেকে সহজে বোঝা যেত না। কদাচিৎ হয়ত অনুচ্চ কণ্ঠে বলেছেন, "ছেলেরা, তোরা আয়।" একবার বিশ্বেশ্বরানন্দ জয়রামবাটীতে গেলে মা বলেছিলেন, 'এসেচ, বেশ করেচ। আমি তোমাকে কদিন ধরেই ডাকচি - রাজেনকে ডাকতে গিয়ে তোমার নাম ধরেই ডাকচি।'

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দের প্রতি মায়ের স্নেহের কথা তিনি অন্যত্র বলেছেন, "জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্র গ্রহণের পরে ঘরের ভিতর খাইতে বসিয়াছি, আমাকে খাইতে দিয়া মাও খাইতে বসিয়াছেন। কথাবার্তা চলিতেছে আর মাঝে মাঝে নিজের প্রসাদ লইয়া মা আমার পাতে দিতেছেন। খাওয়া শেষ হইলে যখন আমি উচ্ছিষ্ট পাথর, বাটি ইত্যাদি তুলিয়া লওয়ার উপক্রম করিতেছি, মা আমাকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন। আমি নিবৃত্ত না হওয়ায় তাঁহার বাঁ হাত দিয়া ডান হাত ধরিয়া বলিলেন, ও কী কচ্চ? আমি বলিলাম আমার এঁটো বাসন ধুয়ে নিয়ে আসি। মা বলিলেন, না, আমিই নেব। আমি বলিলাম, তা কি হয়? আপনি নিলে আমার অকল্যাণ হবে। তখন মা বলিলেন, দেখ মার কোলে ছেলে কত হাগে মুতে, আমি তোমাদের কি করতে পেরেছি বাছা?

মায়ের এমনি সন্তানস্নেহের কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। ব্রহ্মচারী রাসবিহারী যখন জয়রামবাটীতে মায়ের নতুন বাড়ী নির্মানে ব্যাপৃত ছিলেন তখন একদিন দুপুরে বিশেষ কাজে পাশের গ্রামে যেতে হয়। তাই দুপুরে খাওয়ার সময় ফিরতে পারেননি। তখন শীতকাল, বেলা ছোট। সূর্যাস্তের ঘন্টাখানেক আগে বাড়ী ফিরে শুনলেন মা না খেয়ে বসে আছেন। বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে তিনি মাকে

DO NOT COPY

অনুযোগের সুরে বললেন, "মা, তোমার শরীর ভাল নয়, তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে বসে আছ?" মা শুধু বললেন "বাবা তোমার খাওয়া হয়নি, আমি কি করে খাব?"

জয়রামবাটীতে থাকতে স্বামী জ্ঞানানন্দের খুব পাঁচড়া হয়। তখন তিনি নিজের হাতে খেতে পারতেন না, তাই মা তাকে ভাত মেখে খাইয়ে দিতেন এবং তাঁর উচ্ছিষ্ট এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করতেন।

বাল্যকালে মায়ের কাছে এসে অনেকে তাঁকে নিজের গর্ভধারিণীরূপে দেখেছে। স্বামী মহাদেবানন্দ যখন জয়রামবাটীতে মাকে প্রথম দেখেন তখন মনে হয় তাঁর গর্ভধারিণী জননীই বুঝি তাঁর সামনে উপস্থিত। পঞ্চানন ঘোষ বাল্যকালে মাকে দর্শন করতে যান। প্রণাম করার জন্য ঘরে ঢুকে মায়ের পায়ের দিকে তাকাতেই আশ্চর্য হয়ে যান - পা দুখানা যেন হুবহু তাঁর মায়ের আর বালা পরা হাত দুখানা তাঁর সদ্য বিধবা মায়েরই অনুরূপ। এক পা এক পা করে তিনি মায়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ভাবান্তর দেখে মা তাঁকে সস্নেহে বললেন, অমন করছ কেন বাবা? কি হয়েছে? এস বাবা, এস। পঞ্চানন তাঁর কাছে এগিয়ে যেতেই মা তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। সে স্পর্শে পঞ্চানন অনুভব করলেন তাঁর গর্ভধারিণী মা-ই যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সুরেন্দ্র রায় শৈশবে পিতামাতাকে হারান। মায়ের কাছে এসেই তিনি মাতৃ স্নেহের স্বাদ লাভ করেন। তিনি বলেছেন, "একদিন ক্লান্ত হইয়া ঘামিয়া গিয়াছি, মা তাড়াতাড়ি একখানা পাখা হাতে নিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। আমি নিষেধ করিলেও শুনিলেন না, আমাকেও হাওয়া করিতে দিলেন না, বলিলেন, না বাবা, তুমি বস, আমি হাওয়া করি। আর একদিন বিকালে প্রায় চারিটার সময় গিয়াছি, মা প্রসাদী দুধ ভাত রাখিয়াছিলেন, খাইতে দিলেন। জীবনে মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাই নাই, হঠাৎ কেমন ভাবান্তর হইল ও বলিয়া ফেলিলাম, না খাব না – খাইয়ে না দিলে খাবনা। মা পিড়ি পাতিয়া দিয়া খাওয়াইতে বসিলেন। তখনও বলিলাম, না খাব না, মা মুখে ঘোমটা দিয়ে খাওয়ালে খাবনা। মা তখন ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলেন এবং খাওয়াইতে খাওয়াইতে কোথায় আমার বাড়ী, এখানে কি করি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।"

স্বামী প্রশান্তানন্দ মাতৃবিয়োগের পর যখন মায়ের ছবি দেখেন তখন তাঁর ধারণা হয় তাঁর গর্ভধারিণী মা ও শ্রীশ্রীমা অভিন্ন। জয়রামবাটী গিয়ে তিনি মায়ের সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করতেন। একদিন প্রশান্তানন্দ মাকে ধরে বসলেন, তিনি গ্রামের ডাক্তারবাবুর ঘোড়ায় চড়বেন। ঘোড়াটা অবাধ্য ছিল, তাই মা প্রথমে সম্মতি দেননি কিন্তু শেষে আবদারের ঠেলায় সম্মতি দিতে হয়। ঘোড়াকে প্রশান্তানন্দ সহজে বাগে আনতে পারেন নি। ঝোপ, জঙ্গল, বাঁশবনের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটল। অবশেষে ঘোড়াকে বাগ মানিয়ে তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর শরীর রক্তাক্ত এবং পরনের কাপড় ছিন্ন ভিন্ন। এতক্ষণ মা সভয়ে পথের দিকে চেয়ে ছিলেন। ছেলে ফিরে এলে মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এবং নিষেধ না শোনার জন্য বকুনি দিলেন, তারপর নতুন কাপড় এনে পরতে দিলেন।

মায়ের ভালবাসা অপরকে যে কিরূপ আত্মহারা করত ভগিনী নিবেদিতা ও ম্যাকলাউডের কথায় তা অনুমান করা যায়। কেম্ব্রিজ থেকে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন, "সাধের মা, আজ সকালে, খুব সকালে আমি গীর্জায় গিয়েছিলাম। তখন সেখানকার সবাই যীশুমাতা মেরীর কথা ভাবছিল। হঠাৎ তোমার কথা আমার মনে হল। তোমার মনভোলানো মুখখানি, তোমার স্নেহদৃষ্টি, তোমার সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা – আমি সবই প্রত্যক্ষ দেখতেও পেলাম। ... ভালবাসায় ভরা মা আমার। তোমার সেই ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছাস ও উগ্রতা নেই; এ জগতের ভালবাসাও তা নয়; স্নিগ্ধ শান্তির মত তা সকলের কল্যাণ নিয়ে নেমে আসে; এতে কারুর অকল্যাণের ছোঁয়া লাগে না - লীলাচঞ্চল সোনালী আলোর আভা যেন।

স্বামী নির্ভয়ানন্দ একদিন ম্যাকলাউডকে বেলুড় থেকে উদ্বোধনে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মচারী কোন এক সময়ে শুনলেন ম্যাকলাউড আপন মনে অস্ফূট স্বরে বলছেন, "আমি তাঁকে দেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি।" ব্রহ্মচারীকে দেখে তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "পবিত্রতা স্বরূপিনী মা! আমি তাঁকে দেখেছি।"

DO NOT COPY

এই ভাবে প্রায় বেহঁশ অবস্থায় 'মা' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে তিনি প্রায় দু'শ গজ পথ অতিক্রম করেন।

একদিন নিবেদিতা এলে মা তাঁকে একখানা ছোট পশমের তৈরী পাখা দিয়ে বলেন, "আমি তোমার জন্য করেচি।" নিবেদিতা সেটা পেয়ে মাথায় ঠেকান, বুকে রাখেন আর বলেন, কি সুন্দর! কি চমৎকার! মা তা দেখে বলেন, কি সামান্য একটা জিনিসে ওর আহ্লাদ দেখেচ?

ভগিনী নিবেদিতা মাকে একটি জার্মান সিলভারের কৌটো ও একখানা এন্ডির চাদর দিয়েছিলেন। কৌটোটাতে মা ঠাকুরের চুল রাখতেন আর চাদর খানা সযত্নে বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। মা বলতেন, 'পূজার সময় কৌটোটা দেখলেই নিবেদিতাকে মনে পড়ে। জিনিসের দাম কি, স্মৃতিরই দাম।' একবার বাক্স থেকে জিনিসপত্র বার করে রোদে দেবার সময় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ নিবেদিতার দেওয়া এন্ডির জরাজীর্ণ চাদরখানা দেখে বলেছিলেন, 'মা এখানি রেখে কি হবে? ওতে কিছু নেই, ফেলে দিই।' মা নিষেধ করে বলেছিলেন 'না, ওখানি থাক। কাপড়খানি দেখলেই নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কি মেয়েই ছিল, বাবা!'

মা ছিলেন সবার মা। জাতপাত বা ধর্ম কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি। আমজাদ নামে এক তুঁতে মুসলমান মায়ের বাড়ীর দেওয়াল তৈরী করেছিল। একদিন মা তাকে বাড়ীর ভিতরে নিজের ঘরের বারান্দায় খেতে দিয়েছেন, আর নলিনীদিদি উঠানে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পরিবেশন করছে। তা দেখে মা বলে উঠলেন 'অমন করে দিলে মানুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস আমি দিচ্ছি।' খাওয়ার পর আমজাদ এঁটো পাতা তুলে নিয়ে গেলে মা উচ্ছিষ্ট স্থান ধুয়ে দিলেন। তা দেখে নলিনীদিদি বলে উঠলেন 'ও পিসীমা, তোমার জাত গেল।' মা তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।'

পীতাম্বর নাথ জাতিতে যুগী বলে জয়রামবাটীতে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে খেতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। মা তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুমি যুগী বলে সঙ্কোচ বোধ কর? তাতে কি বাছা? তুমি যে ঠাকুরের গণ, ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ।

তোমাকে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই মন্ত্র দিয়েছি, তাতে কি বুঝতে পারনা যে তুমি আমাদের ঘরের ছেলে?'

নৈতিক পতন স্খলন, চারিত্রিক দোষ ত্রুটি নির্বিশেষে মায়ের স্নেহধারা সকলের প্রতি সমান ভাবে প্রসারিত ছিল। একদিন মা জগদম্বা আশ্রমে তেঁতুল তলায় খাটের উপর বসে আছেন এমন সময় এক ডোমের মেয়ে এসে কেঁদে বলল তার উপপতি তাকে অসময়ে ত্যাগ করেচে, অথচ তার জন্যে সে সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছিল। তার করুণ কাহিনী শুনে মায়ের অন্তর বিগলিত হল। মা লোকটাকে ডেকে ভর্তসনা করে বললেন, ও তোমার জন্যে সর্বস্ব ফেলে এসেছে, এতকাল তুমি ওর সেবাও নিয়েচ, এখন যদি তুমি ওকে ত্যাগ কর তোমার মহা অধর্ম হবে, নরকেও স্থান হবে না। মার কথায় লোকটার চৈতন্য হল এবং স্ত্রীলোকটিকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

মায়ের কোন এক সন্তানের নৈতিক অবনতি ঘটলে মাস্টারমশাই ঐ ব্যক্তির মায়ের কাছে না যাওয়া উচিৎ বলে মন্তব্য করেন, কিন্তু সেকথা শুনে মা সকরুণভাবে বলেন, আমার ছেলে যদি ধূলো কাদা মাখে, আমাকেই তো ধূলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

কোন একটি স্ত্রীলোক এক সময়ে মায়ের কাছে আসতেন বলে সাধু ও স্ত্রী ভক্তরা বিরক্ত হন। বলরামবাবুর স্ত্রী গোলাপ মার মারফৎ জানান ঐ স্ত্রীলোকটি ঐভাবে যাতায়াত করলে মার কাছে তাঁদের আসা সম্ভব হবে না। উত্তরে মা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, 'আমার কাছে যারা আশ্রয় নিয়েচে তারা আসবে। একজন এলে যদি আর একজন না আসে, আমি কি করব?' আগে ঐ স্ত্রীলোকটির হাতে কেউ কিছু খেতেন না কিন্তু মা তার হাতে খান এবং অন্য প্রকারে তার সেবাও গ্রহণ করেবন দেখে সকলেই শেষে খেতে আরম্ভ করেন।

চুরি করার অপরাধে মঠের এক উড়িয়া চাকরকে স্বামীজী তাড়িয়ে দেন। সে গরীব, তারই আয়ে সংসার চলত। অন্য কোন উপায় না দেখে সে মায়ের শরণাপন্ন হয়। মা তাকে স্নান আহার করতে বলেন এবং বিকালে বাবুরাম মহারাজ

এলে তাঁকে বলেন, 'দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেচে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে! সংসারে বড় জ্বালা; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝনা। একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" বাবুরাম মহারাজ বোঝাতে চেয়েছিলেন স্বামীজী হয়ত রুষ্ট হবেন। মা সে কথায় কান না দিয়ে শুধু বললেন, আমি বলছি, নিয়ে যাও। এর পর তাকে না নিয়ে গিয়ে উপায় আছে? বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীকে সব খুলে বললে তিনিও আর দ্বিরুক্তি করেননি।

জনৈক ভক্ত যুবক একদিন উদ্বোধনে এসে মাকে বলেন, মা, আমি সংসারে অনেক দাগা পেয়েছি, তুমিই আমার গুরু, তুমিই আমার ইষ্ট, আমি আর কিছু জানি না। আমি এত সব অন্যায় কাজ করেছি যে, লজ্জায় তোমার কাছেও বলতে পারি না। তবু তোমার দয়াতেই আছি। মা সস্নেহে সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'মায়ের কাছে ছেলে-ছেলে।' সে স্নেহস্পর্শে ভক্তের হৃদয় বিগলিত হল।

মানুষের দুঃখ কষ্ট পাপতাপের জ্বালা দেখে মায়ের অন্তর কাঁদত। তাদের পাপের ভার নিজে নিয়ে তিনি তাদের দুঃখ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দিতেন। একদিন স্বামী অরূপানন্দ মাকে বলেছিলেন, তুমি যে মন্ত্র দাও, সে তো ইচ্ছা করেই দাও। তাকে মা উত্তর দেন, "দয়ায় মন্ত্র দিই ... কৃপায় মন্ত্র দিই, নইলে আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে পাপ নিতে হয়। তা কি? শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।"

জীবজন্তু পশুপক্ষীও মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল না। রাধু একটা বিড়াল পুষেছিল। তার জন্য রোজ একপোয়া দুধের বন্দোবস্ত ছিল। সে মায়ের পায়ের কাছে শুয়ে থাকত। একদিন জ্ঞান মহারাজ বিড়ালটাকে জোরে আছাড় দিয়েছিলেন, তাতে মা বড়ই কষ্ট অনুভব করেন। বিড়াল চুরি করে খায়, এই প্রসঙ্গে মা বলেছিলেন, চুরি যে ওদের ধর্ম বাবা, কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে? ওদের স্বভাব হল তাই।

বিড়ালে বিড়ালে খেয়োখেয়ি করে একটির পা ভেঙ্গে যায়। মা দুঃখ করে বলেন, বেড়ালের পাটি ভেঙ্গে গেল গো, কি করে শিকার ধরে খাবে? নলিনকে ডাক

তো। ডাক্তার নলিনবাবু এক টুকরো কাঠ ও ন্যাকড়া দিয়ে ব্যান্ডেজ করে ছিলেন, কয়েকদিন পরে বিড়ালের পা সেরে গেল।

কলকাতার বাড়ীতে গণেন্দ্রনাথের বিছানায় বিড়াল কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করে। মা ও গোলাপ মা তাড়াতাড়ি সাবান দিয়ে বিছানার চাদর পরিস্কার করে রাখেন যাতে গণেন্দ্রনাথ কিছু বুঝতে না পারেন। তথাপি মায়ের আশঙ্কা হয় গণেন্দ্রনাথ হয়ত কোনভাবে বুঝতে পেরে বিড়ালটাকে বিদায় করে দিতে পারেন। তাই মা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন বিড়ালটি এখানেই থাকে, এখানেই খায়, প্রসব হতে যাবে কোথায়? ওকে আর কিছু বোল না।

মায়ের বাড়ীতে একটি পোষা টিয়া পাখী ছিল। মা তার নাম রেখেছিলেন ‘গঙ্গারাম’। সবার মুখে ‘মা’ নাম শুনতে শুনতে সেও মাকে মা-ওমা বলে ডাকতে শিখেছিল। বিশেষ করে পূজার সময় সে ‘মা’ বলে ডাকত। পূজা শেষ করে মা জিজ্ঞাসা করতেন, বাবা গঙ্গারাম কি বলছ? তারপরে প্রসাদী ফলমিষ্টি ও মিছরির পানা এনে সকলের আগে তাকে খেতে দিতেন।

একদিন একটা ছোট বাছুর অস্থির ভাবে ডাকছিল। সকলের অনুমান পেটে ব্যাথা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই প্রতিকার করা গেল না, সকলেই চিন্তিত। বাছুরের ডাক শুনে মা কাছে গেলেন। তার কষ্ট দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে বাঁ হাতে তার নাই ও পেট টিপতে লাগলেন, যেন নিজেরই সন্তান। কিছুক্ষণ ঐ রকম করাক পর বাছুর শান্ত হল।

একদিন একজন নাগা সাধু হাতী চড়ে জয়রামবাটীতে এসেছিলেন। হাতীটি ছোট, সাধুকে কেউ দিয়েছিল। মা বাটিতে করে হাতীটিকে চাল খাইয়ে মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিলেন।

স্বামী অরূপানন্দ শৈশবে মাকে হারান। তাই জীবনে মাতৃস্নেহের স্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। মায়ের কাছে এসে তাঁর সে অভাব দূর হয়। মায়ের স্নেহ পেয়ে তাঁর প্রাণ মন পূর্ণ ও জীবন ধন্য হয়। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি সকলের মা?” মা, বললেন, ‘হ্যাঁ’। ‘এইসব ইতর জীবজন্তুরও?’ ‘হ্যাঁ- ওদেরও।’

মাতৃভাব মায়ের সত্তায় এমনভাবে পরিব্যপ্ত হয়েছিল যে তিনি স্বয়ং ঠাকুরকেও সন্তানভাবে দেখতেন। ঠাকুরকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে দুই-তিনসের দুধ খাওয়ানোর মধ্যে সেই ভাবের পরিচয় আছে। মা নিজমুখেই ঠাকুর সম্পর্কে তাঁর বাৎসল্যভাব স্বীকার করেছেন। নলিনবিহারী সরকার প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশ, কোন ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মা আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখতেন? মা তার উত্তরে বলেছিলেন, 'ছেলের মত দেখি।' ঠাকুর চিরবিরাজমান, তাই অনুভূতি ও উপলব্ধি থেকে মা বর্তমানকালে (Present Tense) উত্তর দিয়েছিলেন। ঠাকুরের মত মায়ের সম্পর্কেও সেই কথা - তিনি চিরবিরাজমানা। তিনি যেমন অতীতে ছিলেন, তেমনই এখনও আছেন, অনাগত অনন্তকাল ধরে থাকবেন। আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, তাঁর অনুপম মাতৃস্নেহধারা সমানভাবে তাপিত সন্তানদের উপর বর্ষিত হচ্ছে, তবে সেই নিত্যলীলা শুধু ভাগ্যবানে বুঝিবারে পায়।

দুবাইয়ের দুই অবাক কান্ড **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

বিশ্বের বৃহত্তম ফুলের বাগান কোনটি আর একই জায়গায় অন্তত ৮০ টি দেশ তাদের পসরা সাজিয়ে হাজিরই বা হয়েছে কোন স্থানে? এশিয়াবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত হতেই পারি কারণ দুটিরই অবস্থান দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায়, পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের দুবাই শহরে। প্রথমটি হঠাৎই এক রঙ্গিন দুনিয়ায় এনে ফেলে মনের মধ্যে ফুরফুরে হাওয়া বইয়ে দেওয়া মিরাক্যাল গার্ডেন আর অপরটি ১৬ লক্ষ বর্গ মিটার সম্বলিত ময়দানে অন্ততঃ ৮০ টি দেশের প্রতিনিধিত্বে আকর্ষণীয় 'গ্লোবাল ভিলেজ'। মিরাক্যাল গার্ডেনের দরজা টপকাতে খরচ অন্তত ২২০০ টাকা, তারপর অবশ্য শুধুই চোখের আরাম। অপর পক্ষে গ্লোবাল ভিলেজের এন্ট্রি ফি তুলনামূলকভাবে অনেকটা কম (25AED ie. Rs.600) হলেও ভিতরে

DO NOT COPY

একবার ঢুকলে সেখানে পকেট হাল্কা করার এমন আয়োজন যে মানিব্যাগকে সামলে রাখাই মুশকিল!

এহেন দুবাইয়ের সাথে একটু পরিচয় করে নেওয়া যাক। যে সাতটি আমিরেত বা রাজ্য নিয়ে সংযুক্ত আরব আমীরসাহী, রাজধানী আবুধাবিকে বাদ দিলে আয়তন আর অর্থনীতিতে দুবাই তারপরেই। আর চাকচিক্যে? বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুবাইমল দেখলে যেমন চক্ষু চড়কগাছ হয় তেমনই অবাক হতে হয় বুর্জখলিফা আর তার পাশের ড্যান্সিং ফোয়ারার আলোকিত বাহার দেখলে। ১৬৩ তলার ২৭২২ ফুট উচ্চতার বুর্জখলিফা এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং, আল আরব সবচেয়ে দামী হোটেল, এমনকি বিশ্বের সেরা সোনার বাজারটাও যখন দুবাই শহরে বুঝতেই পারছেন সে শহর কেমন ঝাঁ চকচকে! অথচ আদিতে দুবাই ছিল এক সামান্য মাছ ধরার গ্রাম। তারপর ১৯৬৬ তে তেলের খনি আবিষ্কারের পরই তার দ্রুত পরিবর্তন। বিগত দু'দশকে তেলের রাজ্য বলে দুবাই যখন অনেক পিছন সারিতে তখন এখানকার শাসনকর্তাদের দূরদৃষ্টি বাণিজ্যিক বন্দর, রিয়েল এস্টেট আর পর্যটনকে হাতিয়ার করে দুবাইকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যে সে এখন UAE-র দ্বিতীয় আর পৃথিবীর কুড়িতম ব্যয়বহুল শহর।

এই দুবাই শহরে পা রাখতে আমাদের উড়িয়েছিল 'দেবলোক' সারথি কিংশুককে সঙ্গে দিয়ে। ৭ই জানুয়ারীর যাত্রা যে চার তারিখে হবে কি হবে না ভাবনায় ছিল তার কারণ এদের গয়ংগচ্ছ ভাব। তবে চারের সকালে টিকিট, হোটেল ভাউচার আর পাঁচের সন্ধ্যায় মোবাইলে ভিসা ঢুকে পড়ায় বুঝলাম দেবলোক ডোবাবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভাবনাগুলো প্রজাপতি হয়ে উড়লো Emirates Airlines এর EK 571-এর সাথে, যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র এয়ারপোর্টের থেকে ঠিক ৮.৫৫ তে ৪৮০ জন প্যাসেঞ্জার নিয়ে সে টুক করে আকাশে ডানা মেললো। ওড়ার সময় চেনা আকাশে রোমাঞ্চ তেমন না থাকলেও দুবাইয়ের মাটি ছোঁয়ার আগে মরু, পাহাড় আর আরব সাগর থেকে কেটে আনা কৃত্রিম খালগুলোয় ছবির খোরাক যথেষ্টই ছিল। তারপর ইমিগ্রেশনের ফর্মালিটি মিটিয়ে আল-উস্তাদ-স্পেশাল কাবাবে

অ্যামিরেটসের খানায় ভরা পেটকে আরো ভরিয়ে যখন রয়্যাল অ্যাসক্যাটের ৫৪২ নম্বর ঘরে ঢুকতে পেলাম তখন স্থানীয় সময় বলছে শেষরাত থেকে দৌড়ে চলা শরীরটার জন্য তিন ঘণ্টা বিশ্রাম একবারে কনফার্মড। ইতিমধ্যে সময়ের হেরফেরে আমরা যে দেড়ঘণ্টা পিছিয়ে গেছি সেটা হাতের ঘড়ি না বুঝলেও মোবাইল কিন্তু সময়ের সাথে দিব্য নিজেকে পাল্টে নিয়েছে। সময় অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার পর সন্ধ্যা ছ'টা থেকে বুর্জখলিফা আর দুবাই মল দিয়ে যে শহরের সাথে পরিচয় শুরু, পরের তিনদিনে বুর্জ-আল-আরব হোটেল, পাম জুমেইরাহ্ দ্বীপ, দুবাই ম্যারিনা, দুবাই ফ্রেম, সর্বোপরি ডেসার্ট সাফারির মধ্যে দিয়ে সে দুবাইকে কিছুটা হলেও চিনে নিতে পেরেছিলাম। তারপর আবুধাবিকেও দেখার নামে একবার ছুঁয়ে আসা হলে বাকি ছিল ঐ মিরাক্যাল গার্ডেন আর গ্লোবাল ভিলেজ। তা, ফিরতি বিমান ধরার আগে সেটাও হয়ে গেল একদিনের ছোটাছুটিতে।

সেদিনটা আমরা হোটেল ছেড়েছি ঠিক সওয়া এগারোটায়। সওয়া বারোটা নাগাদ আল-বারশা সাউথের তিন নম্বর স্ট্রীটের ওপর মিরাক্যাল গার্ডেনের সামনে দাঁড়িয়েও বুঝতে পারিনি কোন রূপকথার দেশ এই বাহাত্তর হাজার বর্গমিটার বাগানে লুকিয়ে আছে। প্রবেশ করা যেতে পারে এখানকার তিনটি গেটের যে কোন একটা দিয়ে। এক নম্বর গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই যেন আমন্ত্রণ পেলাম সবুজ ঘাস ফুলে তৈরী মুখোমুখি দুই বিশাল ঘোড়ার কাছ থেকে। তারপর? এক নম্বর গেট থেকে শুরু করে দুই আর তিন নম্বরকে ছোঁয়ার ফাঁকে কখন যে প্রায় ১৫ কোটি ফুল, ফোয়ারা আর প্রজাপতি দেখে ফেলেছি তা বুঝতেই পারি নি। আসলে এতো শুধু পুষ্পে ভরা দেশ নয়, বিচিত্র তাদের উপস্থাপনা। কখনো ফুলের মিকিমাউস কখনো বা ডোনাল্ড ডাক। তাছাড়া ডেইজি হাঁস, গুফি, প্লুটো আর হুইয়ের ফুলের কাঠামো তো আছেই। এইভাবে বাগান সাজাতে এদের পরিচালক সিটিল্যান্ড রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্টকে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ডিজনির সাথে বসতে হয়েছে, তাই তো ডিজনিল্যান্ডের একখণ্ড আপনি এখানেই পেয়ে যান। শুধু কি তাই? এখানে যে এয়ারবাস এ-৩৮০ কে ফুলের কাঠামোয় পুষ্পক রথ করে তোলা হয়েছে

সেটাই পৃথিবীর বৃহত্তম, তাই স্থান পেয়েছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে। মিরাক্যাল গার্ডেনের শুরুটাও ভারি সুন্দর দিনে। সেটা ২০১৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ভালবাসার দিনে শুরু হয়েছিল বলেই কিনা জানিনা বিশ্বের প্রেমিক যুগলের প্রিয় বিচরণ ভূমি এখন এই বাগান। সকাল ন'টা থেকে রাত্রি ন'টাতেও ভিড় উপচে পড়ে বলে শনি রবিতে বাগান খোলা থাকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত। তবে মিরাক্যালের ম্যাজিক শুধুই অক্টোবর থেকে এপ্রিল। বসন্ত বিদায়ের সাথে সাথে ফুলের জলসা যায় ভেঙ্গে। প্রতি রাতে সাত লক্ষাধিক লিটার জলসিঞ্চন যে ফুলের রাজত্বকে ঝলমল করে রাখে, দুবাইয়ের প্রচন্ড গরম মে থেকে অগস্টের হামলায় তাকে ছারখার করে দেয়। সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় নতুনের আবাহন। আর অক্টোবরে পাঁচমাস বন্ধ থাকা বাগান খুলে গেলে আবার শুরু হয়ে যায় দর্শক সমাগম।

মিরাক্যাল গার্ডেনে আমাদের বরাদ্দ ছিল মাত্রই আড়াই ঘণ্টা। লাল-নীল-হলুদ-সবুজের মেলায় সঙ্গী সাথীরা যে কোথায় হারিয়েছিল জানিনা, তবে সময় যেন দৌঁড়ে পালিয়ে বলে গেল সময় হয়েছে। সেই মত পৌনে তিনটে নাগাদ আবার এক নম্বর গেটের কাছে সবাই এসে যেতেই শুরু হল আমাদের পরবর্তী অভিযান - 'গ্লোবাল ভিলেজ'!

গ্লোবাল ভিলেজের আসল মজা যেহেতু আলোর খেলায় তাই বিকেল চারটের আগে এখানে গেট খোলে না, তারপর একের পর এক দেশকে চিনতে চেয়ে এক প্যভেলিয়ন থেকে অন্য প্যভেলিয়ন ঘুরে বেড়িয়ে থাকতে পারেন রাত একটা পর্যন্ত। ইতিমধ্যে রয়্যাল অ্যাসক্যাটের রাজকীয় ব্রেকফাস্ট হজম হয়ে যাওয়ায় পেট বলছিল খাই খাই আর বিকেল চারটে তখন এক ঘণ্টা দূরে, তাই যেমন ইচ্ছে খাও টেবিলে ঘন্টাখানেক মুখ আর হাত চালিয়ে যখন গ্লোবাল ভিলেজের দরজায়, তখন গেট সবে মাত্র খুলেছে। ভিলেজের শুরুতেই কুয়েতের প্যাভেলিয়ন, তারপর ২৭টি প্যাভেলিয়নে ইয়ামেন, বাহেরিন, ইজিপ্ট, সিরিয়া, তুরস্ক, পাকিস্থান, ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া সহ কম বেশি আশিটি দেশের সংস্কৃতি, রীতিনীতি আর জাতি বৈশিষ্ট্য এখানে উপস্থাপিত। ভারতের প্যাভেলিয়ন সেজেছে জয়পুরের হাওয়া

মহলের সাজে, সেখানে তো একবার উঁকি দিতেই হয়। সামলেও রাখতে হয় ছটফট করা মানিব্যাগটাকে। দেশের জিনিষ কি এত দামি হয়ে উঠলো বিদেশে গিয়ে! এলোমেলোভাবে যে কয়েকটা প্যাভেলিয়নে উঁকি দিয়েছি তাতেই পরিস্কার যে একদিনে বাইরে থেকে সব কিছু দেখে নেওয়া গেলেও সব পেয়েছির আসরে শুধু মুক্তোই খুঁজতে হয়, বিশেষত বরাদ্দ সময় যদি হয় মাত্রই তিন ঘণ্টা। অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত খোলা থাকে এই গ্লোবাল ভিলেজ, তার মধ্যেই পর্যটকের সংখ্যা নব্বই লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। শুধু তো বিভিন্ন দেশের সুভ্যেনির, হস্তশিল্প, পোষাক আর গয়না কেনাকাটা নয়, ভিলেজের অন্যতম আকর্ষণ যে লাইভ বিনোদন শো। তুরকি নাচন তো আমরা নিজের চোখেই দেখলাম, আর শুনলাম বিখ্যাত গায়ক, নর্তক এমনকি শাহরুখ খানের মত অভিনেতা এখানকার স্টেজ মাতায়। আর যদি খাবার কথা বলেন, রাস্তার খাবার থেকে গ'-মে' (Gourmate) ডাইনিং পর্যন্ত বিস্তৃত আন্তর্জাতিক খাবারের স্বাদ এখানে নেওয়ার সুযোগ। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা - যেখানকার খাবারই আপনি পছন্দ করুন, পয়সা ফেললেই সব হুজুরে হাজির!

বেড়াতে বেরিয়ে যদি মার্কেটিংয়ের নামে লাগেজ বাড়াতে চান অন্য কথা, না হলে সেই সময়টায় চোখ মেলে দেখুন আলো ঝলমল ভিলেজ কেমন ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টায়। দেখুন একই রকম আলোকিত পৃথিবীর বৃহত্তম স্টিলের কাঠামোয় UAE-র জাতীয় পাখি সাকের ফ্যালকন (বাজপাখি)। আট মিটার উচ্চতার আট হাজার কিলোগ্রাম ওজনের এই পাখি পাখা মেলেছে ২২ মিটার বিস্তৃতি জুড়ে। রাতের বেলায় এই আগুনে বাজপাখি যেন চিৎকার করে বলছে, আমি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে আছি। অবাক চোখে তাকাই। তিন ঘন্টার মেয়াদ ফুরিয়ে আসে। অনুভব করি গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড দর্শন আমার সার্থক।

DO NOT COPY

গ্লোবাল ভিলেজ, দুবাই

মিরাক্যাল গার্ডেন, দুবাই

মিরাক্যাল গার্ডেন, দুবাই

মিরাক্যাল গার্ডেনে পুষ্প-সজ্জিত বিমান

রাতের বুর্জ খলিফা

দিনের বুর্জ খলিফা

অবভাসিক **শ্রী সুনন্দন ঘোষ**

ফুটপাথ জুড়ে চৈত্র সেলের দাপানি দেখলে
বিশ্বাস হতে চায় না এই তো ক'দিন আগে
দু বছর বন্ধ ছিল রেড রোডের নামাজ,
পয়লা বৈশাখে বন্ধ ছিল দক্ষিণেশ্বরের মন্দির।
খুব তাড়াতাড়ি সব ভুলে যাই।

ভুলে গেছি পাড়ার দেবুদা ৭৫ বছর বয়সেও
এপোলো থেকে ফিরতে চেয়েছিলেন;
পুকুল, দেবা, পার্থ, আরো কতজন
কিছু বুঝে ওঠার আগেই ইতিহাস হয়ে গেলো !
গৃহবন্দী জীবনে কখনও ফোন আসত,
কখনও হোয়াটসএপ মেসেজ,
আমার হাতের আয়ুরেখাও মনে হত মুছে যাচ্ছে চুপিসারে ।

প্রেসার সুগারের ওষুধ খেতে খেতে
ঘুম শব্দটা আজকাল হারিয়ে গেছে আমার অভিধান থেকে।
মাঝরাতে জানালায় দাঁড়াই।
নরম আলোয় মেহগনী পাতার ফাঁক দিয়ে
বারাকপুর রোডটা জড়িয়ে যায় বর্তির বিলের সাথে।
অনেক ছায়া শরীর অবভাসে হাত নাড়ায় –
হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার মানুষেরা।

এপারে একা আমি অপেক্ষা করি এক মহাপথিকের –
যাঁর হাত ধরে ফিরে যাব অবভাস থেকে স্বগত সত্তায়।

DO NOT COPY